Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Nonigopal Chakraborty-er golpobishye loksamaj

ননীগোপাল চক্রবর্তীর গল্পবিশ্বে লোকসমাজ

Binapani Chanda
বীণাপাণি চন্দ
(শিক্ষিকা, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান), একলব্য পরিসর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

Abstract

This paper discusses related about the Folklore based life of Tripura and then also drive to present various folk related aspects of the fiction "Nonigopal Chakraborty -er golpobishye loksamaj", Written by Nonigopal Chakraborty.
Key words: Folklore, Nonigopal, Loksamaj, Tripura, Fiction, Bishye

Article

বাংলাসাহিত্য পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছোটগল্প। ছোট সদস্য হলেও বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার প্রাচুর্যে সুপ্রাচীন এই সন্তানটি। উনিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পের সূচনায় ভোরের আলো জাগা পাখি ছিলেন মূলত রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের পরবতী দশকে বাংলা ছোটগল্পের বৈচিত্র্য পরিদৃশ্যমান।

ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের পূর্বপ্রান্তে এবং বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এক কৃষ্টি ও সংস্কৃতিময় রাজ্য। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে যে সাহিত্যচর্চার অনুশীলন ঘটেছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে একবিংশ শতাব্দীতে এই ধারা আরও বেগবান ও গতিশীলতার রূপ পায়। রাজ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বাংলা সাময়িকী এবং বইমেলার সাকুল্যে ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চা এক নতুন রূপ পায়। ত্রিপুরার কথাসাহিত্য তাই স্বভাবতোই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণের সুস্পষ্ট পদাচরণ, উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ, তাদের আঞ্চলিক সমস্যা ----– সমস্তই ওঠে এসেছে। ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়, জাতি-উপজাতি, জলবায়ু আবহাওয়ায় পুষ্ট লোকজীবন ও লোকসমাজ আখ্যানের অবয়বে স্থান পেয়েছে। তার পাশাপাশি অখ্যাত জনবসতিপূর্ণ লোকসমাজের সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্যমন্ডিত কৃষ্টি-সংস্কৃতি সবকিছুই ত্রিপুরার কথাসাহিত্যের আঙিনাকে সুবিস্তৃত করেছে।

ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্প অনেকটা সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বাংলা ছোটগল্পে পরিদৃশ্যমান। বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বাতন্ত্র্যধর্মীতাই গদ্যশেলীতে এনেছে এক বড়ো রকমের পরিবর্তন। নগর কিংবা গ্রাম-পটভূমি থেকে ওঠে আসা মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্চা এক বিশ্লেষণাত্মক গদ্যশৈলীর আধারে তুলে ধরেছেন গল্পলেখকেরা। ত্রিপুরার গল্পজগতের একজন প্রাজ্ঞ কথোকবিদ ননীগোপাল চক্রবর্তী। ননীগোপাল চক্রবর্তীর (১৯৫১) গল্পের আখ্যানভাগে গড়ে ওঠেছে জাতিদাঙ্গার প্রেক্ষাপটে। তাঁর প্রথম গল্পের নাম- 'ষষ্ঠীদাসের গোমেধ'। জাতিদাঙ্গার অভিঘাতে দেশ থেকে বিতারিত হয়ে পার্বত্য, বন্ধুর ত্রিপুরায় ওঠে আসতে বাধ্য হয় ষষ্ঠীদাস। জলের সুবাস, বাপ-দাদার মাছ ধরার পেশা ছেড়ে অন্যান্য উদবাস্তু মানুষদের মতো টিলা-টংকরে বন কেটে বসত গড়েছিল ষষ্ঠীদাস। ছেড়ে এসেছে জাত ব্যবসা, খুঁইয়ে এসেছে বউ আর কচি মেয়েটাকেও, নিয়ে এসেছিল মাছ ধরার জাল আর সংসারের কিছু

টুকিটাকি যেমন, রঙচটা তোরঙে নিজের দু'য়েকটা পিরাণ, বউয়ের কাপড়চোপড় আর কচি মেয়েটার কয়েকটা জামা ও মাটির খেলনা। দেশ থেকে উদবাস্তু হয়ে প্রথমে শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রিত হয় ষষ্ঠীদাস। উদবাস্তু ক্যাম্পে শুয়ে শুয়ে তোরঙ খুলে বউ ও মেয়ের কাপড়ের গন্ধ শুকতো আর কান্নার আশ্রয় নিতো নিজের দুঃখকে ভুলানোর জন্য।

বর্তমানে ষষ্ঠীদাস ঊনচল্লিশ কার্ড কলোনির রিফিউজি বাসিন্দা। ঊনচল্লিশ কার্ডের অন্যান্য বাসিন্দারা এক সময় জোয়ান মরদ ষষ্ঠীদাসের সঙ্গে লালুমালোর বিধবা বোন সরস্বতীর বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করেছে। কিন্তু সে সংসারটি টিকেনি। কেননা ঘরের প্রতি তার কোনও টানই ছিল না। গোঁসাইর আখড়া বদলে বদলে সে নিজেই মা গোঁসাই হয়ে বসেছে। বয়সে ভাটার টান লাগায় তাই শেষবয়সে আখড়া খুলেছে।

নাও ছেড়ে, জাত-ব্যবসা হারিয়ে ষষ্ঠীদাস 'ছান্যালে'র কাজ করে। অন্যান্য লোকদের ঘরের ছানি থেকে ষষ্ঠীদাসের ছানি দেওয়ার ক্ষমতা ও নিপুণতাই আলাদা। আঝোর বৃষ্টিতেও ষষ্ঠীদাসের ছাওয়া চালে জল চোয়াতো না। ভালো কাজের জন্য গ্রামে তাঁর নামডাকও ছিল। তাছাড়া ষষ্ঠীদাসের কাছেও একটা পরিতৃপ্তি ও আত্মসন্তুষ্টিবোধ কাজ করতো। লোকেরা বলতো –

"ষষ্ঠীরে, তুর নিজের ঘর না বসাইয়া পরের বাসা বানাছ। কি জাত সুখ পাছ?"১

প্রত্যুত্তরে ষষ্ঠীর জবাব –

''ভাইরে পতি খাউরীর পানিত ঘর, আর পর খাউরীর কুনু ঘর নাই, লাগেঅনা। অত ঘর বান্ধি, নিজের চিন্তা কি?''২

ষষ্ঠীদাসের তিনকুলে কেউ না থাকলেও তার একটা ছোট ঘর আছে, তারপাশে একচালা গোয়াল ঘরে গাই 'বাগা' আর একটা দামড়ি বাচ্চা 'রাখনি', একটা মাদি কুকুর আর হুলো বেড়াল নিয়েই তার সংসার। গরুর দুধ বিক্রি করে, ঘরামী কাজ করে কোনওভাবে সংসার চলে ষষ্ঠীদাস। ক্রমাগত দুধ বিক্রি করতে করতে কখন যে সে 'ঘোষ' হয়ে গেছে তা সে নিজেও জানতো না। গাঁয়ের হাটে হরির চায়ের দোকানে সে প্রত্যহ দুধ বিক্রি করতো। এছাড়া অন্য কোনও দোকানে 'রোজ' দিলে চা খেয়ে পয়সা উশুল করে নিত। গল্পকার ননীগোপাল চক্রবর্তীর চোখে গ্রামের এই বাস্তবসম্মত চিত্রটিও এড়িয়ে যায়নি। এখানে গল্পকারের জীবনদর্শণের স্বরূপটি পাঠক পরিমন্ডলীতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'ষষ্ঠীদাসের গোমেধ' গল্পের খলচরিত্র দয়াল সাহা। সে তিপরা ময়ালে ধান, পাট, তিল, বাঁশ ইত্যাদি দাদন হিসাবে দিয়ে থাকে। তাছাড়া হালে 'বাংলা মদ' তৈরির জন্য লাগুড় আর রেশনের আতপ চালও দাদন হিসাবে দিয়েছে। পুরো ময়ালে তার দু'দুটো রেশনের দোকান। তাছাড়া বেনামিতে নানা ধরনের অনৈতিক ও দু'নম্বরের কাজের সঙ্গেও দয়াল সাহা সংযুক্ত।

''দয়াল সাহা তিপরা ময়ালে দাদন দেয়। ল্যাম্পস, প্যাকস ব্যাঙ্ক সব কিছু দয়াল সাহার, দয়াল দাদন দেয় ধান, পাট, তিল, বাঁশ ইস্তক সব কিছু জন্য। হালে 'বাংলা মাল' তৈরীর জন্যও লাগুড় আর রেশনের আতপ চাল দাদন হিসেবে দেয়। ময়ালে দু'দুটো রেশন শপ। ঊনচল্লিশ কার্ডের কেউ কেউ নাকি 'মাল' বানায় দয়াল সাহার কাছ থেকে দাদন নিয়ে। তৈরি মাল বিশ লিটারি জেরি ক্যানে করে প্রত্যেক হাটবারে ট্রিপ আর ক্যান্টারটাও নাকি বেনামীতে তাঁরই।"৩

দয়াল সাহার তিন-তিনটা বাঁধা মেয়ে মানুষ। বিয়ে করা স্ত্রীও রয়েছে শহরে। ষষ্ঠীদাসের মতো বেলারাণীও উদবাস্ত হয়ে এই রাজ্য ওঠে এসেছে। রিফিউজি জীবন তাঁকে বাঁধা মেয়ে মানুষে পরিণত করে তুলেছে। ষষ্ঠীদাস বাড়ির পাশাপাশি বেলারাণীর অবস্থান। দয়াল হরির টাকায় ভালোই চলে যায় বেলারাণীর। বেলারাণীর অবসর সময়ে কথোপকথন ও খোঁজখবর নেওয়ার প্রতিবেশী সঙ্গী ষষ্ঠীদাস। কেননা গ্রামের গেরস্তবাড়ির দিকে পারতপক্ষে পা বাড়ায় না বেলারাণী।

ষষ্ঠীদাস ও বেলারাণী তাদের ফেলে আসা জীবনের নানা কাহিনি পরস্পরের কাছে তুলে ধরে। বয়সের মধ্যগগনে পৌঁছে এখন উভয়ে উভয়ের আশ্রয়স্থল। গল্পকার লিখেছেন---

''ষষ্ঠীদাসকে তাই বিশ্বাস করে বেলারাণী। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে যেন লোকটার ওপর। কোথায় যেন একটা শূন্যতাবোধ কাজ করে। লোকটা যেন একটা গাছ অথবা ন্যাড়া পাহাড়, আছে অথচ নেই। গরু ছাড়া ষষ্ঠীদাসকে অন্য কোন ধ্যান না থাকলেও বেলারাণী তাকে আকর্ষণ করে। তবে মেয়ে মানুষ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। নিছক অবরে-সবরে দুরন্ত বসে কথা বলার জন্যই বেলারাণী ওখানে যায়। বেলাও যেন একটা অবলম্বন হিসাবে ষষ্ঠীকে কাছে পেতে চায়। পুরুষ মানুষ হলেও ষষ্ঠীর মধ্যে কেমন একটা সন্ন্যেসী ভাব।''৪

লৌকিক ভাষা পারস্পরিক কথোপকথনের সম্বন্ধ সঞ্চার করে। বিবিধ ধ্বনির মাধ্যমে ভাষার উদ্ভব হয়। আর সাহিত্যিক ভাষার পাশাপাশি লৌকিক ভাষাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোকভাষা সম্পর্কে প্রখ্যাত ভাষাবিদ পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'লোকভাষার স্বরূপ সন্ধান' প্রবন্ধে অভিমত দিয়েছেন যে, লোকভাষা হলো বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ভাষা। এই প্রসঙ্গে

অধিকতর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং কোনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক একান্তভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকভাষায় ভাষাবন্ধনের সীমাবদ্ধতা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাষিক সংকোচধর্মীতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকভাষা মূল বৃহত্তর জনসম্প্রদায় থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন---একথা সর্বাংশে সঠিক নয়। তাকে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষাও বলা যেতে পারে। লোকভাষার লোক (LOK) প্রসঙ্গত জনগোষ্ঠী, শহর, গ্রাম ইত্যাদি নির্দিষ্টকরণের বাইরে। সংহত সমাজচিন্তন থেকেই তার উপত্তি। ফলত লোকভাষাকে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা বলা চলে না। 'ষষ্ঠীদাসের গোমেধ' গল্পে গল্পকার ননীগোপাল চক্রবর্তী ত্রিপুরার লৌকিক ভাষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই গল্পের পাত্র-পাত্রীদের মুখে লোকভাষার বুলিকে সপ্রযত্নে তুলে ধরেছেন। যেমন, ধুরন্ধর, চরিত্রহীন, লম্পট ও সুবিধাবাদী দয়াল সাহা ষষ্ঠীকে বলেছিল---

''কিতা ষষ্ঠী, পরের ঘরে ছানি দিয়া গেলি, নিজের ঘর আর বসাইলি না। একটা চোখ ছোট করে বলেছিল দয়াল: বেলারাণী তুর দ্যাশের মাইয়া, তারে তুই নিয়া যা, নাইলে তুই আইয়া থাক হের কাছে। এ সেবা শান্তি করব.....।'' ৫

আবার কালিপদ ঠাকুরের শালার জবানিতেও ধরা পড়েছে প্রান্তবর্তী রাজ্যের লোকভাষা---

"সাহাবাবু কইলে জামাইবাবুরে দিয়া একটা বেবস্তাপত্র করাইয়া দেমুনে। কি কও ষষ্ঠীদা।"৬

বেলারাণী ষষ্ঠীদাসের উদ্দেশ্যে অন্যত্র বলে-----

''দাদা গো তুমারে দেখলে আমার দ্যাশের বাড়ির কতা মনে অয়। বাবার কতা মনে অয়। আবার ইবলিশ গুলানরে দেহি। ভগবান জানে পুরুষলুকগুলান ক্যান এমুন পালটাইয়া যায়।" ৭

লোকসমাজে বসবাসকারী জনসাধারণের অভিজ্ঞতাজাত বিষয়সমূহ প্রবাদে ওঠে আসে। প্রবাদ প্রাত্যহিক জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতায় ভরপুর, তাই জীবনের সকল বিষয়কে নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়ে থাকে। 'ষষ্ঠীদাসের গোমেধ' ছোটগল্পেও গল্পকার ননীগোপাল চক্রবর্তী চরিত্রগুলোর কথোপকথনের মধ্যে প্রবাদের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখিয়েছেন। উদাহরনস্বরূপ ''কুত্তার পেডে ঘিয়ে ভাজা পরসাদঅ হজম অয়না। লুম উইঠা জাইবো।"৮

আবার ষষ্ঠীর গরু গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যাওয়ায় ধূর্ত কালিপদ ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্তের প্রতিবিধান শুনে বেলারাণী বলে ওঠেছিল---

"গরু মরলে হকুনের আনন্দ হয়।"৯

লোকসমাজ বসবাসকারী মানুষদের ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দও গল্পে ওঠে এসেছে। যেমন, কালিপদ ঠাকুরের দেওয়া হাড় জিরে জিরে দামড়ি বাচ্চাটাকে ষষ্ঠীদাস অনেক কষ্ট করে বড়ো করে তুলেছে। এখন সেই বাচ্চাটি পোয়াতিতে পরিণত হয়ে গেছে। বাগার চুক্তি অনুযায়ী প্রথম বিয়ানোর পর বাছুর দুধ ছাড়লেই গাইটা আসল মালিক কালিপদকে দিয়ে দিতে হবে। বাছুরটা যাতে দামড়ি বাচ্চা হয় এটাই একমাত্র কামনা ষষ্ঠীর। তাই দিনরাত্রি পীরের কাছে মানত করে থাকে ষষ্ঠী। তার এই মনের অবস্থার কথা বুঝতে পেরে বেলারাণী ষষ্ঠীদাসকে আশ্বস্ত করে এই বলে---

''ইল্লাগ্যা অত কিন্তু কিন্তু কর ক্যান, তুমি চিন্তা কইরোনা দাদা। অহনো ওলান নামাইছেনা আমি দেইখ্যা এইবার দামড়ি বাচ্চাই অইবো।"১০

বিয়ানো তথা গরুর বাচ্চা প্রসব করার ব্যাপারে বেলারাণীর দারুণ হাতযশ রয়েছে। অভিজ্ঞা বেলারাণীর মুখে দামড়ি বাচ্চা হওয়ায় ষষ্ঠীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে---

''তুর মুহে জয় দেক বেলারাণী" ১১

কিন্তু তার পরবতী অংশটুকু স্বপ্নভাঙ্গার আখ্যান। আর সেই আখ্যানে দেখা যায়, গাই বিয়ানোর দিন দশকের মাথায় বিকেলের দিকে অনন্তমাঝির ছোট ছেলেটি এসে ষষ্ঠীদাসকে খবর দেয়---

''জেডা গো জেডা তুমার গাইটা ফাঁস খাইয়া মইরা রইছে টিলার লামছিত....."১২

ষষ্ঠীদাসের সাজানো দুনিয়ায় যেন আঁধার ঘনিয়ে আসে এক মুহুর্তে, কালিপদ ঠাকুরের র্কশ চিৎকারে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। গলায় মৃত গরুর দড়ি ঝুলিয়ে দিন কাটাতে হবে, যতদিন না 'গোবধজনিত' পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তিনি প্রায়শ্চিত্তের প্রতিবিধান দেন., কেননা প্রায়শ্চিত্ত না করলে শেষপর্যন্ত সে মুক্তি পাবে না। আর প্রয়োজনে শুধু 'হাম্বা' শব্দটিই উচ্চারণ করতে পারবে। প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত ধোপা, নাপিত বন্ধ। এমনকি অশৌচও পালন করতেই হবে। 'গোবধজনিত' পাপ একপ্রকার ঘোরতর পাপ। এমনকি প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত ষষ্ঠীদাস একঘর হয়ে থাকবে এবং তার মুক্তিও নেই। এইপ্রকার উদ্ভট প্রায়শ্চিত্তের প্রতিবিধানে ষষ্ঠীকে গুণে দিতে হলো নগদ ত্রিশটি

টাকা। অজ্ঞানকৃত 'গোবধজনিত' হত্যার জন্য ত্রিশ টাকা জরিমানা দিলেও 'জনম-জন্মান্তরী'-য় পাপের জন্য হাজার তিনেক টাকার ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল কালিপদকে। কেননা 'গো' অর্থ্যাৎ গরু হত্যা হলো মহাপাপ। প্রায়শ্চিত্ত না করলে চৌদ্দ-পুরুষকে নরকের দ্বারে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থান্বেষী কালিপদ ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্তের এইসব উদ্ভট প্রতিবিধান শুনে বেলারাণী গর্জে ওঠে। তার মুখের উপর বলে দেয়---

''গরু মরলে হকুনের আনন্দ হয় জানতাম, তুমি যে ক্যান এত আল্লাদ করতাছ ঠাকুর বুঝিনা। বেচারা নাকের উপরে দম কইরা মা মরা ডেহা ডারে একসের কইরা দুধ রোজ কইরা খাওয়ায়। তবু পাচিত্ত অয়না?''১৩

প্রায়শ্চিত্তের জন্য ষষ্ঠীকে এক অদ্ভুত ভিক্ষুকে পরিণত হতে হয়েছে। গলায় দড়ি, পরনে ছেঁড়া ময়লা হেঁটো ধুতি, হাতে চটের থলে, ভিক্ষা করে প্রায়শ্চিত্তের টাকা তুলতে সে দিনভর ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। পরিসমাপ্তিতে মন্ত্রীর কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্তের টাকা তুলতে অসহায় ষষ্ঠী পাড়ি দেয় শহরের অভিমুখে। ভাগ্যের ফেরে অসুস্থ, অশক্ত ষষ্ঠীর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, এর পরবতী অংশটুকু গল্পকারের ভাষাতেই বলা যাক----

''দিয়ে থুয়ে যা হাতে আসে তাতে একটা দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া গেলেও প্রায়শ্চিত্তের টাকার ব্যবস্থা হলোনা। না হোক। অনেকদিন পর যেন শরীর মন একটু ঝরঝরে লাগছে। বেলারাণীর মতো একটা ফুরিয়ে যাওয়া মেয়েমানুষ যদি কালিপদ ঠাকুর বা দয়াল সাহার মুখের উপর কড়া কথা বলতে পারে তবে ষষ্ঠী চুপ করে যাবে কেন! কারো দয়ায় উপর তো সে বেচে নেই।"১৪

গল্পের শেষ পর্যায়ে ষষ্ঠীকে আমরা দেখতে পাই প্রতিবাদী হয়ে ওঠতে। প্রায়শ্চিত্তের নামে সাধারণ অসহায় মানুষদের ঠকানো এবং তাদের কাছ থেকে সবটুকু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করার এই জঘন্য মানসিকতা সম্পন্ন পুরোহিত শ্রেণিকে লেখক এখানে কোণঠাসা করে তুলেছেন। তাই সুবিধাভোগী কালিপদ ঠাকুর যখন মাতৃহারা গরুর বাছুরটাকেও হাতিয়ে নিয়ে যায় তখনই ষষ্ঠীর প্রতিবাদী সত্ত্বা গর্জে ওঠে আর প্রায়শ্চিত্তের দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে------

''মানি না। তুমরার কুনু বিধান মানি না। নিয়া যাও। বেবাক নিয়া যাও। তবে মানিনা মানতাম না তুমারারে ।"১৫

ননীগোপাল চক্রবর্তীর 'বসুধা' গল্পসংকলনের প্রথম গ্রন্থ 'ষষ্ঠীদাসের গোমেধ'। নাতিদীর্ঘ এই গল্পের প্রধান চরিত্র ষষ্ঠীকে। দাঙ্গার মতো বিভীষিকায় পরিস্থিতিতে সে ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। বাপ-ঠাকুরদার মাছ ধরার পেশা ছেড়ে, টিলা-টংকরময় রাজ্যে বন কেটে বসত তৈরী করে ষষ্ঠীকে। কিন্তু এখানে এসেও সুস্থির জীবনযাপন তার কাছে দূরহস্তই থেকে যায়। ষষ্ঠীর মতো সাধারণ মানুষদের পরিস্থিতি যে কখনও অনুকূল থাকে না, লেখক প্রকারান্তরে সেদিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কিন্তু গল্পের সমাপ্তিতে ষষ্ঠীকে তিনি প্রতিবাদী চরিত্র শিখবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

কুড়ি ঘরের এক বস্তি মালিক অধীর, অধীরের ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনি বিধৃত হয়েছে 'খাসদখল' গল্পটিতে। খাপছাড়া অধীরের জীবনে স্থিতিবস্থা কখনও আসেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদবাস্ত হয়ে এই রাজ্যে ওঠে আসে অধীর। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ-বারো বছর। গল্পকার লিখেছেন---

''মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্প জীবনের কথা আবছা মনে পড়ে তার। দশবারো বছরের ছেলেটা কোনদিন ক্যাম্পে এসে উঠেছিল। ক্যাম্প বাবুরা করুণা করে ঠাঁই দিয়েছিলেন অফিসে। যুদ্ধ শেষে সবাই দেশে ফিরে গেল। অধীর গেল না। কোথায় যাবে? চা দোকান থেকে শুরু করে গাড়ির আড্ডা, অন্যথায় পথ সম্বল। গাড়ি ধুতে ধুতে কখনও যে 'এচিষ্টন' হয়ে গেল তার হিসেব থাকেনি।"১৬

অধীরের জীবনালেখ্যই গল্পের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু তার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ছিন্নমূল জীবনের কাহিনি কথাকার বিধৃত করেছেন। দশ-বারো বছরে উদবাস্ত হয়ে আশ্রয়ের ঠিকানায় এই পার্বত্য প্রদেশে ওঠে আসে অধীর। সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে সে আশ্রিত হয় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে। অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় সামিল হয়। প্রথমে শুরু করে চা-দোকানের কাজ দিয়ে, তারপর গাড়ির 'এচিষ্টন' হয়ে যায়। গাড়ির ড্রাইভারের লাথি, ঝ্যাঁটা, উচ্ছিষ্ট ভাত খেয়ে কখন যে ড্রাইভারে পরিণত হয় তার হিসেব অধীর রাখেনি। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কুড়ি ঘরের বস্তির মালিক হিসেবে নিজেকে উন্নীত করে অধীর।

কিন্ত প্রচ্ছন্নভাবে অধীর নিঃসঙ্গ। সেই ছোটবেলা থেকেই তার লড়াই শুরু হয়েছে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে। আর সুখ ও শান্তির অন্বেষণে। সম্পর্কের নৈকট্য কখনই তার ভাগ্যে জুটেনি। পাহাড়ি অঞ্চলে ভাঙ্গা জিপ চালানোর মধ্য দিয়ে সে জীবনসংগ্রাম শুরু করে। প্রতি হাটবারে বেশি ট্রিপের জন্য অধীরকে ছুটতে হতো বন্ধুর পাহাড়ি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এই সময়টাতে সে চার-পাঁচেক পাহাড়ি ভাষা গড়গড় করে বলতেও শিখে যায়। কিন্তু আকণ্ঠ বাংলামদ পানের অনতিক্রম্য নেশায় দিবারাত্রি নিমজ্জিত হয়ে থাকে অধীর। এরই মধ্যে ওস্তাদের মেয়ে সবিতাকে মনে ধরে যায় অধীরের এবং সবিতাকে ঘরিণী করে নিজের জীবনে স্থান দেয়। নতুন নেশা, শরীর, ভালোবাসা সবকিছু মিলিয়ে অনাড়ম্বর জীবন কেটে যায় নবদম্পতির।

''দুটো মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পায়নি অধীর। ভেবেছে, নির্বান্ধব জগতে অন্তত একটা প্রাণী আছে তার।"১৭

একবার বর্ষার মরসুমে বিপদ-সংকুল পাহাড়ি জনপদে ট্রিপ দেওয়ার সময় আকণ্ঠ মদ্যপানের দরুন অধীর জিপগাড়ি সমেত খাদে পতিত হয়। গাড়ির দুর্ঘটনায় হাসপাতাল থেকে মাসচারেক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেই শুনতে পায়, 'এচিষ্টন' ছোকরার সাথে তার বউ পালিয়ে গেছে। অ্যাক্সেল ভাঙ্গা গাড়ির মতো তীব্র ঝাঁকুলি খেয়ে ধপ করে বসে পড়ে অধীর। এতো ভালোবাসা, হাসি-খুশি, শরীরের অন্ধিসন্ধি সবকিছু খোলাসা করে কীভাবে অন্যপুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে তা বুঝে ওঠতে পারে না অধীর।

এরপর থেকে জীবনের অন্য মোড় ঘুরতে থাকে অধীরের। জমানো কিছু টাকা আর ধার দেনা করে একটা ভাঙ্গা জীপ গাড়ি কিনে নতুন ভাবে জীবনে বাঁচার আস্বাদ খোঁজে। এই জীপটাকেই 'ঘর-সংসার-ইয়ার-দোস্ত মায় ইস্তিরি' হিসেবে গ্রহণ করে নেয় সে। কথাকার লিখেছেন---------

"নির্বিকার জীবনে স্রোতের শ্যাওলা সে। হাত বাড়ালে সস্তা হাফ গেরস্ত মেয়েমানুষ পেয়ে যায়। একটা সার সত্য জেনেছে সে, শুধু পেটের জন্য মেয়েমানুষগুলো শরীরের অন্য সব অংশ বেঁচে দিতে পারে। ভালবাসার কথা, প্রেম -পিরিতের ছলাকলা মাছির ভ্যানভেনানির মতো মনে হয় তাঁর। তবু সবিতার শরীরটাকে মনের আড়াল করতে পারেনা। মাঝে মাঝে ভাবে, মানুষ তো তাঁর খাস জমিন নয় যে, তার

দখলিস্বত্ব থাকবে তাতে। মানুষ সে যেই হোক, মেয়ে কিংবা ছেলে, আসলে কেউই খাস জমিন নয়। একটা স্বাধীনতা তাঁর মধ্যে থাকেনি, সে প্রকাশ্যে হোক বা লুকিয়ে চুরিয়ে। মুনি ঋষি বা দেবতা হতে পারলে ব্যাপারটা চুকে বুকে যেত।"১৮

এক নির্বিকার জীবনের মানুষ অধীর। তাঁর এই নিস্তরঙ্গ জীবনে আসে মালতী। এই মালতীকে একদল ওঁচা মাতালের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল অধীর। মালতীকে জন্মলগ্নে হাসপাতালের বারন্দায় ফেলে উধাও হয়ে গিয়েছিল তার মা। মালতী বেড়ে ওঠেছে নিশিকন্যাদের আশ্রয়ে, তারপর সে পরিণত হয় বেওয়ারিশ পথ শিশুতে। নির্ভেজাল ভিক্ষাবৃত্তি এবং টুকিটাকি জিনিস কুড়িয়ে প্লাস্টিকওয়ালাদের কাছে বিক্রি করে কোনমতো দিন গুজরান করতো অদ্ধা অর্ধাহার কিংবা অনাহারে পথশিশু মালতী। কখন যে কৈশোর পেড়িয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো সেটা সে নিজেও বুঝে ওঠতে পারেনি। হাড় জিরজিরে বুকের আচ্ছাদনের জন্য একটা জামা সে পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু অনেক অকথ্য যন্ত্রণার মূল্য দিয়ে। রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটানোর জন্য নিষিদ্ধ জীবনকে বেছে নেবার আগেই তার উপর হামলে পড়েছিল ওঁঠা মাতালের দলবল। শীতের সেই রাতে রক্ষাকর্তা রূপে এগিয়ে আসে অধীর এবং নিজের শূণ্য ঘরে তাকে ঠাঁই দেয়। একগাদা খাবার দাবার এবং কাপড় চোপড় নিয়ে আসে আশ্রিতার জন্যে।

নারী হিসেবে পুরুষদের কাছে সম্মানও পাওয়া যেতে পারে সেটা মালতীর অজানা ছিল। শরীরের বদলে সম্মান কখনও পাওয়া যায়না,------ পারিপার্শ্বিকতা এবং সহজাত ধারণা মালতীকে এটাই শিখিয়েছে। অধীরের ঘরে মালতী যেন একটা লাওয়ারিশ মাদি কুকুর। ভরপেট চোখে কৃতজ্ঞতা আর দাম চুকিয়ে দেবার একটা মানসিক প্রস্তুতি সর্বদা কাজ করে মালতীর মধ্যে। অন্যদিকে বস্তির বিন্দুমাসীর উপর মালতীর দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অধীর। আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেও অধীরের ঘরটাকে ভালোবাসতে শিখে যায় মালতী। অধীরের এই ছোট ঘরটাকে নিজের সাম্রাজ্য বানিয়ে তোলে মালতী। আবার অধীর যখন ঘরমুখী হয় তখন রান্নাবান্নাসহ ঘরের যাবতীয় কাজ করে নেয় সে। কোন এক বর্ষারাতে ভূমিশয্যা থেকে তুলে আনার সময় মাতাল অধীর এবং মালতীর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রকৃতির নিয়মে উভয়ে মিলিত হয়, মালতীর শারীরিক সুখে বশবর্তী হয়ে পড়ে মাতাল অধীর। ধীরে ধীরে অধীরের আসা এবং থাকার মেয়াদ বেড়ে যায় আর মালতীও রূপান্তরিত হয় অধীরের প্রকৃত গৃহিনী রূপে। অন্যদিকে অধীরের মানসিক টানাপোড়েন তাকে যেন অন্যদিকে ধাবিত করে। বিশেষত প্রথমা স্ত্রী সবিতা এবং বর্তমানের গৃহিণী উভয়কে যেন একক মনে হয় তাঁর। লেখক এখানে অধীরের এই মনস্তাত্বিক দোটানাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ননীগোপাল চক্রবর্তী লিখেছন-----

''অনেক ভেবেছে অধীর। বয়সের একটা বিরাট ফারাক। সে নিজে মানুষ হলেও মালতী তো অন্য মানুষ। তার শরীরটাই সব নয়, মন বলেও তো কিছু একটা আছে। মালতীরা কি সতিই ঘর বাঁধে? মাঝে মধ্যে গুলিয়ে যায় সব কিছু। মাঝে মাঝে ভাবে, চলুক যেভাবে খুশি। মালতী তার স্বপ্ন নিয়ে, সে তার জীবন নিয়ে। তবু ফাঁকফোঁকর গলে কখন যেন সবিতা উঁকি মারে। অথচ মালতী আর সবিতা ..."১৯

গল্পের অগ্রগমণে দেখা যায়, গাড়ির কাজে অধীর চলে যাওয়ার পর অফুরন্ত সময় কাটানোর জন্য মালতীকে সে একটি হাত ফেরতা সেলাই মেসিন কিনে দিয়েছিল। বস্তির লোকজনদের ছোটখাটো অর্ডারী কাজ করে, রেডিমেড সেলাই করে হাতে কিছু পয়সা

আসতে শুরু করে। মালতীর নিজের রোজগার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অবশেষে ভ্রষ্টপথে ধাবিত হয় মালতী। সোজাপথের গোপন সুলুক সন্ধানের হদিশ দেয় বিন্দুমাসী।

"শরীরের জন্য রাতের খাবার এনে দিত মাসী। তাদের কেউ মিষ্টি দোকানের কর্মচারী, রাজমিস্ত্রি, কেউবা কল-মিস্ত্রি--- নানান পেশার লোক। তাদের সারাদিনের রোজগার মালতীর শরীর কিনতে খরচ হয়ে যেত। বিশ ঘর বস্তির ভাড়ার অতিরিক্ত এ আয়। রপ্ত হয়ে গিয়েছিল মালতী এ ধান্দায়।"২০

মালতী নানাবিধ অবৈধ সম্পর্ক অধীরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেও বেশিদিন গোপন করে রাখতে পারেনি। প্রথমত মালতীর এই ব্যভিচারিণী রূপ দেখে অধীর ক্রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর উপলব্ধি---

''মনে মনে ভাবে অধীর, মানুষ তো আর খাস জমিন না। তার মালিক আছে। মনটা অইল গিয়া তার শরীলের মালিক। খাস জমিন দখল করন যায়। কিন্তু মানুষের। না সম্ভব নয়, আর মাইয়া মানুষ...? তারে দখল করন যায়, কিন্তুক মালিক হওন যায়না।"২১

এইসব কথা ভাবতেই একটা বিচিত্র হাসি খেলা করে অধীরের মুখে। আর এভাবেই গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন গল্পকার।

'বনবাসর' গল্পের শুরুটাই হয়েছে অন্যভাবে। কথাকার গল্পের প্রারম্ভেই চমক সৃষ্টি করে লিখেছেন-----

''শানাই এর জীবনটা নিয়ে আদপেই কোন গল্প হয়না। তার দুঃখ অথবা দুঃখবিলাস হাজারো মেয়ের আছে এদেশে। সময় ও পরিস্থিতি যেখানে নিয়ে এসেছে সেটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় সবার কাছে, দুটো মানুষ যেখানে এক সঙ্গে একটা সমস্যার মুখোমুখি হয় তখন মেয়ে বলে শুধু একতরফা সহানুভূতি পেয়ে যাবে কেউ সেটা হয়না। আসলে ব্যক্তিগত দুঃখের আঁচ পোয়ানো কারো কারো ইচ্ছে সুখও হতে পারে। আবার কেউ বা বাধ্য হয়। প্রশ্ন সেখানেই। শানাই-এর হাতে ক্ষমতা আছে অর্থের। কিন্তু অর্থহীন আবেগ তাকে বিবশ করে দেয় বলেই পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তাকে।

সত্য কথা বলতে গেলে শানাই-এর কাজের মেয়েটির একটা দুঃখ রয়েছে, অতীত দুঃখ। তার নাম সরলা হলেও সরলারেখার মতো জীবন নয় তার। তাকে নিয়ে একটা গল্প হলেও হতে পারে। সরলার অতীতের অর্ধেক গাঁ ঘরের আর দশটা অসহায় মেয়ের মতো।"২২

সরলার গরীব বাবা সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। অবলা সরলাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। স্বামীর ঘর করতে গিয়ে নতুন নতুন আঘাতে জীবনের ছকটাই পাল্টে যায় সরলার। স্রোতের শেওলার মতো ভেসে যায় সরলার সংসার। আসলে বরপণ নিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত হয়েছিল।

''সরলার বাবা-মা দুটো পরিবারের সম্পর্কের মধ্যে এই শক্ত খেজুর কাঁটাটা একটা নির্বেদ অসহায়তায় সহ্য করেছে। আর সরলা বার কয়েক বাপের বাড়ি স্বামীর ঘর তালবানা করতে করতে একদিন পুরো সুতোটা ছিঁড়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল।"২৩

শেষপর্যন্ত স্বামীর ঘর করে ওঠা হয়নি সরলার। কিন্তু স্বামীর ঘর না হলেও ঘর করেছে কয়েকজনের। কিন্তু সব জায়গাতে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে অনাবশ্যক তৈজস হিসেবে----

"এই সময়টায় তাঁর মনের ক্ষত শুকোতে শুকোতে একটা অনুভূতিশীল শক্ত খোলসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অতএব বেলা থাকতে থাকতে শরীরের ফায়দা তোলার জন্য পা বাড়িয়েছিল ঘরের বাইরে।"২৪

অন্যদিকে শানাই বড়ো হয়েছে মায়ের আদর্শকে অবলম্বন করে। তাঁর মা রাজনীতিকে জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। রাজনীতিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে স্বামী, সংসার এমনকি সন্তান কোনও কিছুই গুরুত্ব পায়নি তাঁর কাছে। নারী জাগরণ, গণ জাগরণ, মানুষের অধিকার প্রদানে মায়ের প্রতিনিধিত্ব শানাইকে অনুপ্রাণিত করে। মায়ের এই আদর্শকে পাথেয় করে বড়ো হয়ে ওঠে শানাই। কিন্তু এই শানাই-ই একদিন বেজাতের ছেলেকে বিয়ে করে বসলো। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত একটি ছেলেকে বিয়ে করে শানাই তাঁর মায়ের আদর্শকে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল নিজের জীবনে। অন্যদিকে পিতামাতা কেউই হস্তক্ষেপ করেনি মেয়ের স্বাধীনতায়।

‘‘কিন্তু অভিজাত্য আর চেনা ছকের জীবন ছেড়ে শানাই একটা আটপৌরে জীবনে ঢুকল। খেলাঘর ছেড়ে, খেলার মাঠ ছেড়ে আরেকটা খেলা ঘরে। নিচুতলার জীবনের সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ততই মার খেয়েছে পড়ে পড়ে।..... আসলে শানাইদের সেই অদৃশ্য পাঁচিল, তার ব্যবহারের আভিজাত্য এবং শিক্ষার পাঁচিলটা ডিঙোতে পারত না বলেই হয়তো ষাঁড়ের মতো ক্ষেপে যেত লোকটা। অতো আদরের শানাই মার খেয়েছে লোকটার হাতে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়েছে একটা বছর। ভেবেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। কিন্তু শানাই না পারল লোকটাকে শোধরাতে, না পারল নিজেকে মানিয়ে নিতে।’’২৫

সংসারের নানা ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও শানাই প্রতিবাদী হয়ে ওঠতে পারেনি। ভদ্রতাবোধ বা সংস্কারের বেড়াজাল তাঁর পায়ে শেকল বেঁধে দেয়। মার কাছেও মুখ ফোটে কিছুই বলতে পারেনি শানাই, কেননা তাঁর পেটে বাচ্চা, শরীরও ক্রমশ ভেঙে পড়েছে। সন্তানসম্ভবা অবস্থায় যে পরিমাণ সুষম খাদ্য ও যত্নের প্রয়োজন তাও দূরহস্ত। তাঁর ধৈর্য ও সহ্যের বাধা চূর্ণ হয়ে যায় যেদিন বর্ষার তোড়ের মতো গালাগাল আর আকণ্ঠ মদ্যপান করে শানাই-এর স্বামী তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়। রাতভর ঘরের বাইরে বসে ঠাণ্ডায় কাকভেজা অবস্থায় মার কাছে আশ্রয় নেয় সে। বারান্দায় পা দিয়েই অচৈতন্য হয়ে পড়ে শানাই, জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় খুঁজে পায়। পাশে দোলনায় সুপ্ত অবস্থায় একটি নিষ্পাপ শিশু;----- সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায় শানাই। সংসারের পাট চুকিয়ে অন্যজীবনে সে পদাপর্ণ করে। যোগ্যতা আর মায়ের কল্যাণে একটি চাকুরি জুটিয়ে চাকুরি রক্ষা আর মেয়েকে মানুষ করার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখে শানাই। চাকরিসূত্রে বনবাসের জীবনকেই সে গ্রহণ করে নেয়। ক্ষমতাগর্বী মা-কে ক্ষমা করতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে অন্ধ এই মহিলা তাঁর দোসরের গালে চড় কষিয়ে দেওয়ার শব্দটা আজও তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। নিজের স্বামী নামক দাম্ভিক ব্যক্তিটার প্রতিও সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেনি শানাই।

জীবনের পরন্ত বেলায় শানাই সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে কাছে পায় সোমনাথকে। গল্পের এক পরিচ্ছেদ জুড়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক --------

‘‘শান্ত গভীর চোখ নিয়ে একটা সৌম্য চেহারার লোক দাঁড়িয়েছিল আগ দেউড়ির বেড়ার ধারে। তার আসাটাকে কেন জানে না ঠেকাতে পারেনি শানাই। ঘর ছিল না তার। হোটেলের চার দেয়াল হয়ে গিয়েছিল তার বসত। কেউ ছিলনা তিনকুলে। এমন সময় এসেছিল লোকটা যখন চার চোখের মিলনে বুকের রক্ত ছলকে উঠার বয়সও নয়। তবে মনে হয়েছিল বিশ্বাস করা যায় লোকটাকে। একটা শান্ত নদীর মতো দীর্ঘদিন বয়ে গেছে জীবনের পাশাপাশি। দিতেও চায়নি, নিতে চায়নি কিছু।’’২৬

নিঃস্বার্থভাবে শানাইয়ের জীবনে এগিয়ে এসেছিলেন সোমনাথ। শানাইয়ের মেয়ের বিয়ের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি একা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এমনকি শানাইয়ের মায়ের মৃত্যু সংবাদ ছাপা খবরের কাগজটাও প্রথম এনে দিয়েছিল সোমনাথ। সুখে-দুঃখে, সময়-অসময়ে এই লোকটাকে কাছে পেতো শানাই। আর এইভাবে বনবাসের দিনগুলো ভরে ওঠেছিল উজ্জ্বলতায়।

অফিস থেকে অবসর নেওয়ার দিন তাঁর মেয়ে–জামাই- নাতি আর সোমনাথ ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর ফুলের তোড়ার আড়ালে কান্নাভেজা লাল চোখ লুকিয়ে নাতির গাল টিপে আদর করে প্রৌঢ়া শানাই। আর এই দিনই শানাইকে ছোট্ট একটা পাহাড়ী বাংলো উপহার দেয় সোমনাথ। এক শান্ত, সমাহিত জীবনের বর্ণনা দিয়ে কথাকার গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন------

"ছোট্ট মতো পাহাড়ী বাংলো বাড়িটার বারান্দায় বসে কতো কথা মনে পড়ে যায়। মেয়ে জামাই এসেছিল। থেকেছিল ক'টা দিন। চলে গেছে ওরা। সেদিকেই চেয়ে বসেছিল শানাই। ধীরে ধীরে সিড়ি বয়ে উঠে আসছেন বন্ধু সোমনাথ। অস্ত সূর্যের আলোয় আভাময় দিব্য কান্তি বলে ভ্রম হয়। এত শান্ত এত সৌম্য শীতল। পাঁচ বছর হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্বের সহবাস শানাইয়ের। জীবনের শেষবেলায় শুধুই এক সহমর্মী, আর সরলা দৈনন্দিন সঙ্গী আবশ্যক আসবাব।"২৭

ষাটের দশকের শেষের দিকে ত্রিপুরার গল্পজগতে নতুন ছোঁয়া আসে। ছোটগল্পের পাশাপাশি কবিতার অন্তঃস্বরূপের গভীর ঐক্য এই সময়কালে পরিলক্ষিত হয়। এই দশকের পরবর্তী দশকে ত্রিপুরার গল্পভুবনে আসেন কথাশিল্পী ননীগোপাল চক্রবর্তী। তাঁর গল্পে বৈষয়ের বৈচিত্র্য ওঠে এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আবার কখনও পরিচিত জগত কিংবা চেনা-জানা জীবনকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন, তাঁর কথাসাহিত্যের অঙ্গনে। দেশভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে ওঠে আসা উদবাস্তু মানুষ যেমন তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তেমনি আধুনিক জীবনযন্ত্রনাবোধ ও বিচিত্র জীবনের স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তহারার যন্ত্রনা এবং জীবনের নানান গতিপ্রকৃতি তিনি সহজেই পরিমাপ করতে পেরেছেন। তাঁর বেশিরভাগ ছোটগল্প স্থানীয় সমস্যা নিয়ে লেখা হলেও আবেদনের গভীরতায় ও পরিব্যপ্তিতে এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

উল্লেখসূত্র

(১) রায় সন্তোষ, চক্রবর্তী কৃত্তিবাস (সম্পাদনা) 'ত্রিপুরার বাংলা গল্প চল্লিশ থেকে নব্বই', প্রত্যাশা পাব্লিকেশন, আগরতলা (ত্রিপুরা), প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭ পৃ. ২৩৫.

(২) তদেব, পৃ. ২৩৫.

(৩) তদেব, পৃ. ২৩৬.

(৪) তদেব, পৃ. ২৩৭.

(৫) তদেব, পৃ. ২৩৬.

(৬) তদেব, পৃ. ২৩৬.

(৭) তদেব, পৃ. ২৩৭.

(৮) তদেব, পৃ. ২৩৯.

(৯) তদেব, পৃ. ২৩৮.

(১০) তদেব, পৃ. ২৩৮.

(১১) তদেব, পৃ. ২৩৮.

(১২) তদেব, পৃ. ২৩৮.

(১৩) তদেব, পৃ. ২৩৯.

(১৪) তদেব, পৃ. ২৪০.

(১৫) তদেব, পৃ. ২৪০.

(১৬) চক্রবর্তী ননীগোপাল, 'বসুধা', প্রকাশক--ভট্টাচার্য নিরুপমা ও ঘোষ পূরবী, পৃ. ১৪.

(১৭) তদেব, পৃ. ১৫.

(১৮) তদেব, পৃ. ১৬.

(১৯) তদেব, পৃ. ১৭-১৮.

(২০) তদেব, পৃ. ১৮.

(২১) তদেব, পৃ. ১৯.

(২২) তদেব, পৃ. ২০.

(২৩) তদেব, পৃ. ২০.

(২৪) তদেব, পৃ. ২০.

(২৫) তদেব, পৃ. ২২.

(২৬) তদেব, পৃ. ২৫.

(২৭) তদেব, পৃ. ২৬.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১) চক্রবর্তী ননীগোপাল, 'বসুধা', প্রকাশক--ভট্টাচার্য নিরুপমা ও ঘোষ পূরবী, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা।

২) রায় সন্তোষ, চক্রবর্তী কৃত্তিবাস (সম্পাদনা) 'ত্রিপুরার বাংলা গল্প চল্লিশ থেকে নব্বই', প্রত্যাশা পাব্লিকেশন, আগরতলা (ত্রিপুরা), প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।

৩) অশ্রুকুমার সিকদার, ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।

৪) দাশ নির্মল, রমাপ্রসাদ দত্ত : 'শতাব্দীর ত্রিপুরা', অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা ২০০৫।

৫) শ্যামল ভট্টাচায´, 'পাঠ প্রতিক্রিয়া, উত্তর পূবা´ঞ্চল পর্ব'(প্রথম খণ্ড) ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা- ২০১৩।